নিষ্কলুষতার সংগ্রহশালা : ওরহান পামুকের নতুন উপন্যাস

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

আমার কৈশোরকালে, বিশ্বের চিত্রকলাবিদ্যা চর্চায় যাঁদের অপরিহার্য বলে জানলাম, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। তাঁর ছবি যত দেখতে লাগলাম, ততই বিরাগ জন্মাতে লাগল। তার মধ্যে একটা ছবি ছিল 'সূর্যমুখী ফুল'। আগে আমাদের বাড়ির বাগানে নতুন নিড়ান দেওয়া ধূসর মাটির বেডে অকস্মাৎ এক ঝাঁক আলো, স্ফূর্তি আর জীবন নিয়ে এদের ফুটে উঠতে দেখেছি। সেদিন বিখ্যাত চিত্রীর ছবিতে সেই সূর্যমুখীদের দেখে মেলাতে পারলাম না। একটা শ্বেতাভ ফুলদানিতে কয়েকটা সূর্যমুখী গোঁজা। কেউ খাড়া, কেউ নুয়ে পড়েছে। কয়েকটা আবার আধভাঙা বোঁটায় পঙ্গু। পশ্চাদ্‌পটের দেওয়াল বিষণ্ণ এলা রঙের। যে টেবিলের উপর ফুলদানিটি রাখা, তার দৃশ্যমান উপরিতলের জমি এবড়ো-খেবড়ো। রং ইয়েলো আকারের একটা ঘষা ঘষা সংস্করণ। কোথায় সূর্যমুখীর উজ্জ্বল হলুদের তীব্র আশ্লেষ? তাদের রং অমনি ঘষা আকার থেকে খয়েরির কাছাকাছি পৌঁছেছে। বোঁটার সবুজের লেপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গাঢ়। মাঠে যে ফুল ফুটে উঠতে দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে, যেমন উঠেছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের —ঝাঁক, ঝাঁক ড্যাফোডিল দেখে, ছবিতে তাদের দেখে সেদিন মন খারাপ করে উঠল। গঘকে সরিয়ে রাখলাম। সরিয়ে রাখলাম ঠিকই, কিন্তু কী করে কে জানে তিনি তখনই কোনোভাবে আমার মনের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানেই থাকলেন অন্তরালে। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের আলাপচারিতা হল আর একটা পরিণত বয়সে।

একইভাবে পড়তে পড়তে সরিয়ে রাখতে হল পামুকের দি মিউজিয়াম অফ ইনোসেন্স। মনটা তেতো হয়ে উঠল। মনে পড়ল ঠিক এমনটাই হয়েছিল ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারি পড়তে গিয়ে, অথবা মোরাভিয়া দ্য এম্‌টি ক্যানভাস, তাঁকে চট করে চিনে ফেলি। চিনে ফেলি তাঁর উপন্যাসের নায়ক কামালকে। সে এই দেশে, এই সময়ে, এই শহরেও আমাদের বড়ো চেনা। এই উপন্যাসের দেওয়াল-জোড়া প্রেক্ষাপটের একটেরেয় একটা নজর এড়িয়ে যাওয়া ঝুলে থাকা ছবির মতো একটা চরিত্র হয়ে আছেন পামুক নিজেও।

কামালের জীবনের অনেকগুলো বছর জুড়ে মোটা বইখানা, অনেকখানি জুড়ে সেই সময়ের তুর্কির শহুরে সংস্কৃতির রূপ। তবুও পাঠক দেখেন একটি আদতে একটা প্রেমের গল্প। সে প্রেম বাঁধা পথের বা মাপা পথের পরিক্রমা নেয়নি। সে প্রেম দায়িত্বহীন, লক্ষ্যহীন। সে একটি অন্ধ শক্তির মতো যা নায়ককে তার ঈপ্সিত নির্দেশে টেনে নিয়ে যায়। নায়কের অবস্থা তখন মাঝ-নদীতে পালহীন নৌকোর মতো। স্রোত তাকে ইচ্ছামতো যে দিকে খুশি টেনে নিয়ে যায়। কূলের কাছাকাছি নিয়েও আছড়ে ফেলে।

কী আছে এই বইটিতে? একজন নোবেলজয়ী লেখক তাঁর প্রতিটি বইতে আবির্ভূত হন পাঠকের অনেক আশার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে। বিশ্বসাহিত্যের এরকম অবসেসিভ প্রেমের কাহিনির অভাব নেই। পৃথিবীর সব দেশে, সব ভাষায়, সব কালে বোধহয় এই কাহিনি লেখা হয়েছে। লোকসাহিত্যগুলিও এর দ্বারা পুষ্ট হয়ে ডাঁটো হয়েছিল। আজ এ সবের অধিকাংশই হয়তো কালের গর্ভে নিপতিত হয়েছে। তবু তারই মধ্যে টিকে গিয়েছে কয়েকটি। তারা টিকে গিয়েছে, কারণ এই বহুকালের বহু পরিচিত কাহিনিতেও তারা নতুন কোনো আবেদন যোগ করতে পেরেছে, আলো ফেলেছে কাহিনি-সাহিত্যের বিস্তৃত হলঘরের কোনো এক ছায়াচ্ছন্ন কোণে। দেখে নেওয়া যাক সেরকম কিছু উপাদান আছে কি না এই বইতে।

সংক্ষেপে কাহিনিটি হল এইরকম—বিশ শতকের শেষের দিকে ইস্তানবুল শহরের সবচেয়ে ধনী পরিবারের মধ্যে এক বাড়ির সন্তান কামাল। তার বাগদত্তা সিবালও পালটি ঘরের। যদিও তাদের অবস্থা এখন পড়তির দিকে, তবুও তার প্রেডিগ্রি আছে। ইস্তানবুলের উঁচু সমাজে তাকে কামালের স্ত্রী বলে পেশ করতে কোনো অসুবিধে নেই। সে পারি শহর ফেরত। এক ঝলক দেখলেই সে বুঝতে পারে বিখ্যাত ব্র্যান্ড জেনি কোলোন-এর নাম লেখা হ্যান্ডব্যাগটি আসল না নকল। উপযুক্ত মর্যাদাময় ইস্তানবুল হ্যারিংটনে দুজনের প্রথামাফিক বাগদানের আর বেশি দেরি নেই। এই অনুষ্ঠান স্থির হওয়ায় পারস্পরিক বিশ্বাসের বাতাবরণে তাদের দৈহিক মিলনও হয়েছে। যদিও সিবাল আলোকপ্রাপ্তা; সে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিতা। সচেতনভাবে প্রাকবৈবাহিক কৌমার্যের ট্যাবুকে গুরুত্ব দেয় না। সে তার মনের গভীরে যাই থাক না কেন। তাদের এই মিলনের ক্ষেত্রে হল কামালদের পারিবারিক রপ্তানি অফিসের ঘরের একটি সোফা। কর্মচারীরা ব্যাপারটা আঁচ করে। কামাল ও সিবালও চায় যে তাদের আলোকপ্রাপ্ত গুটিকত বন্ধুরা ব্যাপারটা জানুক এবং তাদের আধুনিকতা ও সাহস নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওদের দুজনকে উদ্দেশ করে বাহবা দিক। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল, একটা সামান্য ঘটনা কামালের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক সন্ধ্যায় যখন দুজনে হাঁটতে বেরিয়েছে, তখন রাস্তায় একটি বুটিকের জানালায় ঝোলানো জেনি কোলন-এর একটি হ্যান্ডব্যাগ দেখে সিবালের ভালো লেগে গেল। সেরকম একটি ব্যাগের দাম সে সময় একজন কনিষ্ঠ আমলার ছ-মাসের বেতনের সমান। এ ক্ষেত্রে যে কোনো যোগ্য বাগ্‌দাতার যা করা উচিত, কামাল তাই করল। সে পরের দিন সকালে ওই দোকানে গিয়ে সেই ব্যাগটি কিনে ফেলল।

এ পর্যন্তও ঘটনাবলি ঠিক পথে চলছিল। গোল বাধল সেই বুটিকের দোকানদারনিকে নিয়ে। প্রথম দেখাতেই

সেই অষ্টাদশী তরুণীর প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করল তিরিশ বছরের যুবক কামাল। সে তখন বোধহয় নিজেও তার স্বরূপ বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটির নাম ফুসুন। সে কামালের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া—তুতো সম্পর্কের বোন। এ রকম সম্পর্কে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। একজন যোগ্যা প্রায় বাগ্‌দত্তাকে ছেড়ে কামাল একজন দরিদ্র দোকানদারনিকে বিয়ে করবার কথা স্বমহলে বলবে কী করে। ফুসুনের মা নেসিবে চাচি সেলাই করে দিন আনে। তাকে প্রয়োজনে বাড়িতে ডাকেন কামালের মা। সে সেলাই করবার সময় তার সাথে একটু-আধটু গল্পও করেন। কিন্তু সেই আত্মীয়াটির নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন না। তাছাড়া ফুসুনের বাপ-মা একটা 'অন্যায়' করেছেন। তাঁরা তাকে একটি বিউটি কনটেস্টে অংশ নেওয়া অনুমতি দিয়েছিলেন। এর থেকে মনে হতে পারে যে ফুসুনের চরিত্র ভালো নয়—কামালের মা কামালকে সে রকমই ইঙ্গিত দেন।

যথাসময়ে ইস্তানবুল হ্যারিংটনে ঘটা করে কামাল ও সিবালের বাগ্‌দান অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অনেক নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ফুসুনও আছে। অন্যদের মতোই নাচে অংশ নেয়। কিন্তু, ওই অনুষ্ঠানের পর অদৃশ্য হয়ে যায় ফুসুন। সে তার বাবার সঙ্গে কোনো এক অজ্ঞাত জায়গায় চলে গেছে। কামাল তাঁর খোঁজ পায় না। তার আগের প্রায় দু-মাস দেহ মিলন ঘটেছে কামাল ও ফুসুনের, কামালদের একটা পুরোনো ফ্ল্যাটে। তাদের মিলনের বর্ণনা দিয়েই শুরু এ উপন্যাসের। তার পরেও বার বার দৈহিকভাবে মিলিত হয় তারা। যদিও কামাল জানে সে সিবালকে বিয়ে করবে। মেয়েটিও জানে কামাল সিবালকে বাগ্‌দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কামাল বুঝতে পারে ফুসুনের প্রতি তার আকর্ষণ শুধু দৈহিক খিদেয় নয়, একটা অন্ধ ভালোবাসা সেই চালিকাশক্তি, যা আগে আড়ালে ছিল, এখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ফুসুনকে খুঁজে বেড়ায় কামাল। সে শহরের আনাচে-কানাচে তাকে খোঁজে। এর মধ্যে কামাল আর সিবাল কিছুদিন এক সাথে বাস করে। একদিন কামাল তার 'সাময়িক বিচ্যুতি'-র কথা সে খুলে বলে সিবালকে। সিবাল রেগে যায়। তার ভাবী স্বামী একদিন এক 'সস্তা দোকানদারনি'-র কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তথ্য তাকে আহত করে। ফুসুন সস্তা ও দুশ্চরিত্রা। যদিও সে ও ফুসুন দুজনেই একজন মাত্র পুরুষের সঙ্গেই মিলিত হয়েছিল এবং সে পুরুষ একই লোক। কামাল। সিবাল ভাবে বিষাদমগ্ন কামাল মানসিক রোগগ্রস্ত। কামালও তা মেনে নেয়। সিবালের পরামর্শে সে মনস্তত্ত্ববিদের কাছেও যায় (আধুনিক তুরস্কের এও এক ফ্যাশনেব্‌ল নয়া আমদানি)। তাতে কাজ দেয় না। সিবাল পারিতে চলে যায়। এর মধ্যে কামাল ফুসুনের খবর পায়। তার চিঠির জবার আসে একটি সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণ পত্রে।

একদিন পর আবার যখন দুজনের দেখা হল, তখন অনেক জল বয়ে গেছে। সিবাল ক্লান্ত এবং হতাশ্বাস হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কামালের বাবার মৃত্যু হয়েছে। যখন দুজনের দেখা হল তখন পাঁচ মাস হল ফুসুনের বিয়ে হয়ে গেছে একটি মোটাসোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে। করমর্দনের পর ফুসুন তার মোটা স্বামীর পিছনে দাঁড়িয়ে কামালরে সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সেই কামালের সাথে, যার সাথে মেরহামেত অ্যাপার্টমেন্টের অতগুলো সন্ধে (কামালের হিসেবে এক মাস আঠাশ দিন) কেটেছে তার কত নিবিড় অন্তরঙ্গতায়। এতদিন বাদে ফুসুনকে দেখতে পেয়েই তাকে আলিঙ্গনের ইচ্ছেটুকুও অপূর্ণ থেকে গেল। সগে করে আনা গোলাপের স্তবক অবহেলায় স্থান পেল বাড়ির ফুলদানিতে। এর পরে আট বছর এবং প্রায় সাড়ে তিনশো পাতা জুড়ে কামাল করমর্দনের সময়ে হাতটুকু ছোঁওয়া ছাড়া ফুসুনের অঙ্গস্পর্শও করতে পারেনি। তবু সে আট বছর ধরে ওদের বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করে গেছে (কামালের হিসেবে ১,৫৯৩ বার), ফুসুনের মায়ের রাঁধা 'চমৎকার' খাবার খেয়েছে, তার বাবার সাথে গেলাসের পর গেলাস রাকি নামের মদ পান করতে করতে পরিবারিক টেলিভিশনে তখনকার তুরস্কের একমাত্র চ্যানেলটি দেখে গেছে।

কামাল ইস্তানবুল শহরের কত না জায়গায় গেছে ফুসুনের সঙ্গলাভের আনন্দে। যদিও ফুসুনের ব্যবহারে তখন সে কেবল পরিবারের এক সম্মনিত ধনী আত্মীয়, তার বেশি কিছু নয়। সে বছরের পর বছর ধরে স্বস্তি খুঁজেছে সস্তার হোটেলে, সস্তা পানশালায়, নিকৃষ্ট ফিল্মে আর সেই ফিল্মের জগতের ছোটোখাটো মানুষদের সাহচর্যে, যারা বড়ো করে স্বপ্ন দেখে, আর দেখে তাদের সেই স্বপ্নগুলোকে চুরমার হয়ে যেতে।

ফুসুন চলচ্চিত্র নায়িকা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে। তারও অনেক পরে ফুসুনের সঙ্গে তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হল। সে আর কামাল নতুন করে ঘর বাঁধবার কথা ভাবতে লাগল। তারা দুজনে আবার পরস্পরের কাছাকাছি এল। এক রাতে, এক হোটেলে তারা আবার মিলিত হল।

তখনই কামালের জীবনে আবার ট্র্যাজেডি নেমে এল। আকস্মিক দুর্ঘটনা ফুসুনকে চিরতরে সরিয়ে নিয়ে গেল, আর কামাল একই সাথে আহত হয়েও দীর্ঘ চিকিৎসায় সেরে উঠল। সে সেরে উঠল বটে কিন্তু তার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখল চলে যাওয়া ফুসুনের স্মৃতি। ফুসুনের ব্যবহৃত ছোটোখাটো জিনিসগুলি তাকে তার প্রিয়তমার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে লাগল।

এখান থেকেই গল্পটা চেনা ধাঁচের বাইরে চলে গেল। সেরে ওঠা কামালের মনটা আটকে থেকে গেল চলে যাওয়া ফুসুনের স্মৃতির আবর্তে। ফুসুনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পরের বছর কাটায় সে যেসব জিনিস জমিয়ে রেখেছে বা 'চুরি করে' রেখেছে বা ফুসুনের ঘরের এখানে ওখানে যা পড়ে রয়েছে যা সাজানো রয়েছে, যার

প্রত্যেকটা জিনিস তাকে প্রেমিকার স্মৃতি উসকে দেয়। তাই যা দেখে তাই সে যত্ন করে রাখে। এ ব্যাপারে তার সমব্যথী কেবল ফুসুনের মা। ধীরে ধীরে সে তার সংগ্রহ বাড়াতে থাকে, জোগাড় করতে থাকে সেই সমস্ত নিদর্শন যা তাকে সে সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সংগ্রহ করে পুরোনো ছবি, তাদের দেখা ফিল্মের বিলবোর্ডে। দরবারি করে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া সেই গাড়ির ধ্বংসাবশেষও নিয়ে আসে সে। ক্রমশ সে এগিয়ে যেতে থাকে একটি সংগ্রহালয় তৈরির দিকে। যা ছিল তার একান্ত নিজের, আর হয়তো অংশত তার নিকটাত্মীয় ও কিছু বন্ধু-বান্ধবের , তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করে সে।

আমার এবার উপন্যাসটির কয়েকটি অধ্যায় একটু আলাদা করে দেখি। প্রথমে দেখে নিই 'অধ্যায় ৮১ : নিষ্কলুষতার সংগ্রহশালা'। এই অধ্যায়টির নাম উপন্যাসের নামে। আমরা ইনোসেন্স শব্দটির বাংলা করেছি নিষ্কলুষতা। যদিও ইংরিজি শব্দটির পুরো ব্যঞ্জনা এতে আসে না, তবু এর চেয়ে কাছাকাছি আর কিছু ভেবে পাওয়া গেল না। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে পামুকের মূল রচনা ইংরিজিতে নয়, তুর্কি ভাষায়। শব্দটির কিছু অনুষঙ্গ হারিয়েছে। এই অধ্যায়টির নাম উপন্যাসটির নামে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র কাহিনির কোনো চুম্বক এখানে উপস্থিত নেই। এতে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন কামালের সংগ্রহশালা থেকে সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়ানোর। সে এর থেকে তার নিজস্ব সংগ্রহশালা গড়ে তোলার রসদ খুঁজে নিতে থাকে। তার প্রথম যাত্রা পারি থেকে। তারপর তা শহর থেকে শহরে, দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ল্যুভর ইত্যাদির মতো বড়ো বড়ো সংগ্রহশালায় নয়, তার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে ছোটো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগ্রহশালাগুলিতে। যখন সে কোনো বিখ্যাত লোকের নাম-সংগ্রহশালায় দেখে তখন তাঁর কীর্তিকে প্রকাশকারী দ্রষ্টব্যগুলি তাকে তত আকর্ষণ করে না যতটা করে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র। যেমন, বিখ্যাত চিত্রী গুস্তাভ মোরোর নামের সংগ্রহশালা। দেখা যাক কামাল সংগ্রহশালাটা দেখে কী বলছে : 'আমার পারি-বাসের শেষ দিনগুলোতে, ফুসুনের পাখিগুলোকে স্মরণ করে, আর আমার হাতে অবসর থাকায়, আমি গুস্তাভ মোরো সংগ্রহালয়টি দেখতে গেলাম। প্রুস্ত এই শিল্পীকে খুব সম্মান দিতেন। আমার মোরোর ধ্রুপদি ধরনের, মুদ্রাদোষ আক্রান্ত, ঐতিহাসিক ছবিগুলো ভালো লাগেনি, কিন্তু সংগ্রহশালাটি ভালো লেগেছিল। চিত্রী মোরো তাঁর শেষ জীবনে চেয়েছিলেন যে, যে বাড়িতে তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাটিয়ে গেলেন, সেখানে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আঁকা হাজার হাজার ছবি প্রদর্শিত হোক। বাড়িটি ক্রমশ একটি সংগ্রহশালায় রূপ নেয়। সেই তাঁর বিশাল দোতলা স্টুডিয়োটিকেও তার হাতার মধ্যে নিয়ে নেয়। এইভাবে বাড়িটি একটি স্মৃতির বাড়িতে রূপ নেয়, হয়ে ওঠে এমন এক ''সেন্টিমেন্টাল সংগ্রহশালা'' যেখানে প্রতিটি জিনিসই অর্থপূর্ণ আলোকে ঝকঝক করে ওঠে। যখন আমি হেঁটে হেঁটে শূন্য ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠা কাঠের মেঝের উপর দিয়ে, ঢুলতে থাকা দারোয়ানদের পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তখন একটা অনুভূতি আমাকে গ্রাস করছিল যা প্রায় ধর্মীয়। (আমি এর পরের কুড়ি বছর আরও সাত বার ওই সংগ্রহশালায় যাব, আর যখনই এওই ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটব, তখন প্রত্যেকবার ওই একই শ্রদ্ধা এবং ভয় মেশানো অনুভবের উপস্থিতি লক্ষ করব।)' কামালেরও পরিকল্পনা সে তার সংগ্রহশালার চিলে ছাদের ঘরে (attic) বাস করবে। আর ওখান থেকেই একদিন মৃত্যুলোকে যাত্রা করবে।

এই অধ্যায়েই কামাল ফুসুনের মাকে তাঁদের বাসস্থানটিকে (যেখানে তার প্রিয়তমা ফুসুন জীবনের শেষ কটি বছর কাটিয়েছিল) সংগ্রহশালায় রূপান্তরের প্রস্তাব দেয়। অধায়ের শেষ দিকে গ্যারাজওয়ালার কাছ থেকে দুর্ঘটনার ভাড়া গাড়িটিকে কিনে নেয় কামাল। তার বাবার '৫৬ সালের শেভ্রলে এই গাড়িটি। ভাঙাচোরা খোলটি একটা গাছের নীচে তখনও পড়ে ছিল। তার কিছু কিছু চালু যন্ত্রাংশ গ্যারাজওয়ালা বিক্রি করে দিয়েছে। ওই ভাঙা গাড়িটি হয়ে ওঠে কামালের সংগ্রহশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ না করে পারা যায় না অনেক সংগ্রহশালার মধ্যে লেখক কলকাতার রবীন্দ্র সংগ্রহশালার (জোড়াসাঁকো না আকাদেমি অভ ফাইন আর্টস?) সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে শুধু রবীন্দ্রনাথের আঁকা জলরঙের ছবির প্রদর্শনের কথা। আমাদের মনে সাধ জাগে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের স্মারক - সম্বলিত শান্তিনিকেতনের সংগ্রহালয়টি তিনি একবার দেখলে পারতেন।

পরের অধ্যায় হল 'অধ্যায় ৮২ : সংগ্রাহকেরা'। সংগ্রহশালায় দেখাবার সে সব জিনিস কামালের কাছে ছিল (কিছু সংগৃহীত, কিছু ফুসুনদের বাড়ি থেকে চুরি করা) আর যে সব জিনিস ফুসুনদের মায়ের ও কামালের যত্নে ওই বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়াও কিছু সংগ্রহের দরকার ছিল; সেই সময়কার যে সব জিনিস তাদের দুজনের একসাথে কাটানো সময়কে মনে করিয়ে দেবে, তার সংগৃহীত হল এই অধ্যায়ে উল্লেখিত সংগ্রাহকদের কাছ থেকে। সে সব চলচ্চিত্র তাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের লবি ফটোগ্রাফ, পোস্টকার্ড, সিনেমা টিকিট, রেস্তোরাঁর মেনু কার্ড, ইস্তানবুল শহরের অনেকেই এই সব জিনিস জমাতেন। সমাজে অবহেলিত ভুলে যাওয়া এই মানুষদের একটি প্রাণস্পর্শী চিত্র স্বল্প পরিসরে ধরেছেন পামুক। তিনি এদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : ১. গর্বিত সংগ্রাহকেরা, যাঁরা তাঁদের সংগ্রহ প্রদর্শন করতে ভালোবাসেন (পাশ্চাত্য এ রকম সংগ্রাহকদেরই বেশি দেখা যায়।) ও ২. লাজুক সংগ্রাহকেরা, যাঁরা তাঁদের সংগ্রহ লুকিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন। কামাল এই দ্বিতীয় শ্রেণির সংগ্রাহকদের কাছ থেকেই তার ওই জিনিসগুলি সংগ্রহ করেছে। এদের কাহিনি করুণ। আরও করুণ কারণ লেখক এদের জীবনের এই অর্থহীন নেশার দিকটি দেখিয়েছেন। এদের সংগ্রহ কোনো প্রদর্শশালায় প্রদর্শিত হয় না, এরা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের

কাছে উপেক্ষিত, অনেকেই অবিবাহিত। তাদের সংগ্রহের পরিমাণ ঈশপের গল্পের সেই উটের মতন ক্রমশ তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়েছে। কোথাও তারা ঘরে এক কোণে কোনোমতে একটা খাট পেতে থাকে, কোথাও তাদের সেটুকু জায়গাও নেই। এক সংগ্রহক তার সংগ্রহের চাপে মারা যায়, মৃতদেহ উদ্ধার হয় চার মাস পরে যখন গ্রীষ্মের গরমে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ধারকারী দমকল কর্মীদের জানলা দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল, যে হেতু সংগ্রহের চাপে দরজা খোলাই যায়নি। এই অধ্যায়টি বইটিকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। কামাল নিজেও এই সংগ্রাহকদের মতোই এক অর্থহীন, করুণাযোগ্য সংগ্রহকারী এ ঈঙ্গিতও কি লেখক দিতে চেয়েছেন।

একটু পিছিয়ে যাই। এবার দেখা যাক 'অধ্যায় ৪৬: নিজের বাগ্‌দত্তাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি স্বাভাবিক?' অবশেষে কামাল আর সিবালের দেখা হল। তারা পরিচিত এক রেস্তোরাঁয় নিশাহারে দেখা করা ঠিক করল। কারণ কামাল ভেবেছিল ওই চেনা পরিমণ্ডলে তাদের এই শেষ সাক্ষাৎকার অতিরিক্ত উত্তপ্ত বা অতি অশ্রুময় হয়ে উঠতে পারবে না। সিবাল কিন্তু সেদিন ছিল একদম স্বাভাবিক। তাঁর আলোচনা শুরু করল নিজেদের পরিবারের কথা বলে। যদিও এই দীর্ঘ কাহিনিতে কামাল ও কিছুটা ফুসুন ছাড়া বাগি চরিত্রগুলোর ওপর তেমন আলো পড়েনি, তবু এই অধ্যায়ে পামুক সিবালের চরিত্রটি ফুটিয়েছেন মুনসিয়ানার সাথে। সে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন আধুনিক তুর্কি রমণী। কামালের এই অন্ধ প্রেম সে বুঝতে পারে না। সে জানতে চায় কামাল কি এটা মনে করে যে একটা দোকানদারনির জন্য কারুর পক্ষে তার বাগদত্তাকে ত্যাগ করা স্বাভাবিক? কামাল জবাবে যখন বোঝাতে চায় সে এই ঘটনায় দোকান, সম্পদ বা দারিদ্র এদের কারও কোন ভূমিকা নেই, তখন সিবাল প্রতিবাদ করে। সে আবারও বলে যে কামালের আচরণ অস্বাভাবিক; এরকম ঘটনা তুর্কি সিনেমা ছাড়া কোথাও ঘটে না। কামাল জবাব দেয় 'আমি তুর্কি সিনেমায় বিশ্বাস করি।' তখন সিবাল বলে, 'কামাল এ ক-বছরে আমি তোমাকে কোনো তুর্কি সিনেমা দেখতে যেতে দেখিনি, একবারের জন্যও নয়।...' সে বলে যে তার ধারণা কামালের আচরণ কোনো মনস্তাত্ত্বিক কমপ্লেক্সে সঞ্জাত— হয়তো তা দরিদ্র দেশে বড়োলোক হয়ে জন্মাবার কমপ্লেক্স। সে আরও বলে যে হয়তো কামাল যে ফুসুনের কৌমার্য হরণ করেছিল, তার জন্যে সে কোনো দায়িত্ববোধ থেকে এ কাজ করছে। কিন্তু, সিবাল এক নিশ্বাসে বলে যে কুমারীত্বের এত গুরুত্ব নেই। আমাদের মনে পড়ে যায় কামাল এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে সিবালের কুমারীত্বও হরণ করেছিল। সিবাল হয়তো বলতে চায়, দেখ আমি ওই গরিব মেয়েটির চেয়ে কতটা আলোকপ্রাপ্ত, আধুনিক। আমি তো এই ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছি না, আমি তো তোমার কাছ থেকে কোনো করুণ প্রত্যাশা করছি না। অস্বস্তি কাটাতে কামাল পরিচিত এক দম্পতিকে তাদের টেবিলে ডেকে নেয়। সিবাল তাদের সামনে একদম স্বাভাবিক আচরণ করে তাদের সম্পর্কের চিড় ধরা পড়তে দেয় না। সে কামালকে হয়তো আবার বুঝিয়ে দেয়, দেখ আমি কত অভিজাত। তোমার ওই দোকানদারনির মতো নই। তাদের দুজনের এই শেষ দেখা।

এক একটি অধ্যায়ে এক-একটি পার্শ্ব চরিত্র ধরা পড়ে। যেমন 'অধ্যায় ২১ : আমার বাবার কাহিনি : মুক্তোর দুল'। কামালের বাবা এক দিন এক রেস্তোরাঁয় বসে তাঁর জীবনের একটি অনুচ্ছেদ বলেন। তাঁর প্রেমিকার কথা। বিবাহের অনেক পরে, ছেলেদের জন্মের পরে, তিনি প্রেমে পড়েন। তার প্রেমিকা তাঁর ব্যবসা - অপিসের এক কর্মী। এগারো বছর ধরে তাঁদের প্রেম চলেছিল। তারপর যখন প্রেমিকা আর অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না, তিনি তাঁকে বললেন তাঁর আর কামালের মার মধ্যে একজনকে বেছে নিতে, তখন কামালের বাবা নিজের পরিবারকেই বেছে নিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ভেঙে গেল। পরে তিনি জানতে পারলেন সেই মহিলা আর বিয়ে করেননি। তিনি মারা গিয়েছিলেন। তাঁকে দেবেন বলে যে মুক্তোর দুল জোড়া তিনি কিনেছিলেন, সেটা কামালকে দিলেন। বললেন, সে যেন এটা সিবালকে উপহার দেয়। আর যেন কখনো তার মনে দুঃখ না দেয়। বাবা তাঁর পকেট থেকে সেই মহিলার একটি বিষণ্ণ ছবি বার করে দেখালেন। অনেক পরে কামালও একদিন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ফুসুনের একটি বিষণ্ণ ছবি বার করে লেখককে দেখিয়েছিল। দুলদুটি সে সিবালকে দেয়নি, ফুসুনকে দিতে চেয়েছিলেন। সিবালকে দুঃখ না দেওয়ার যে অনুরোধ সে সিবালকে দেয়নি, ফুসুনকে দিতে চেয়েছিল। সিবালকে দুঃখ না দেওয়ার যে অনুরোধ তার বাবা কামালকে করেছিলেন, তাও সে রাখতে পারেনি।

আমরা এবার আসি কাহিনির প্রথম অধ্যায়ে— 'অধ্যায় ১ : আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত'। মাত্র দেড় পাতার এই অধ্যায়টি কামাল এবং তার প্রেমিকা ফুসুনের দৈহিক মিলনের বর্ণনা। বইয়ের অন্য সব ঘটনার মতোই, কামাল এ ঘটনার দিনক্ষণ স্থানও নিখুঁতভাবে মনে রখেছে— ২৬ শে মে, ১৯৭৫, সোমবার, বিকেল পৌনে তিনটের কাছাকছি তাদের পারিবারিক পড়ে থাকা ফ্ল্যাট মেরহামেত অ্যাপার্টমেন্ট। এই বাড়িতে ফুসুনের প্রথম আসা ও তাদের প্রথম দৈহিক মিলনের ঘটনাদুটি রয়েছে যথাক্রমে ৭-৯ পরিচ্ছেদে। ছোটো ছোটো বাক্যে, কোনো উচ্ছ্বসিত ভাষা ছাড়াই নায়কের জবানীতে তার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্তের বর্ণনা। আমাদের মনে পড়ে আলবার্তো মোরাভিয়ার কথা। এমনই সংযত বাক, এমনই গদ্যময় সরল বাক্য, এমনই খুঁটিনাটির বিবরণে সেখানেও কথক তার জীবনের গভীর মুহূর্তগুলির কথা বলে ওঠে। এখানে কামাল তার বর্ণনা শুরু করে এভাবে— 'সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত, যদিও আমি তখন তা জানতাম না। যদি জানতে পারতাম, যদি এই উপহারটি আমার মনে লালন করতে পারতাম, তাহলে কি সব কিছু অন্য রকম ভাবে ঘটত? হ্যাঁ, যদি তখন

আমি এই নিখুঁত সুখের ঘটনাটিকে চিনে নিতে পারতাম, তা হলে আমি তাকে সজোরে আঁকড়ে থাকতাম, কখনো তাকে ফসকে যেতে দিতাম না...' আমাদের সকলের জীবনেই কি তা হয় না? জীবনের সবচেয়ে অমূল্য মুহূর্তগুলিকে তখনই চিনতে পারি কই? সে ঘটনার রেশ কেটে যাওয়ার অনেক পরে তাকে রোমন্থন করি। কখনো তাকে অবলম্বন করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই।

কামালও তার জীবনের এই রকম হঠাৎ জ্বলে ওঠা কতগুলো সময়খণ্ডকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। সে তার অসহ স্মৃতির ভার সহ্য করতে না পেরে, তাকে বহন করতে না পেরে, তা জনসমক্ষে ছড়িয়ে দেয়। তার সংগ্রহশালায় এই স্মৃতির কণাগুলোকে সে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। তার এই কাহিনির প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ তার সংগ্রহশালার কোনো না কোনো প্রদর্শকে ঘিরে আছে। এ ভাবে তার জীবনের এতগুলো বছর সে কোনো না কোনো বস্তুকে আশ্রয় করে লতার মতো বেড়ে উঠেছে।

এরকম আমরা আগেও দেখেছি যে প্রেমিক বা প্রেমিকা তার প্রেমাস্পদের স্মৃতিকে আকঁড়েই বেঁচে থাকে। এর উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যেও অপ্রতুল নয়। কিন্তু সে সব স্মৃতিচিহ্নগুলিকে নিয়ে একটি সংগ্রহালয় করা ও সেই সংগ্রহলায়টিকে সাধারণের দেখবার জন্য খুলে দেওয়া, এ একেবারে নতুন ব্যাপার। বইয়ের গোড়ায় (কামালের অনুরোধক্রমে) একটি মানচিত্রে সংগ্রহালয়টি দেখিয়ে দেওয়া আছে। তার প্রবেশ-টিকিটের একটি ছবিও বইতে ছাপা আছে। শুধু এই নয়, লেখক ওরহান পামুক স্বয়ং ঈস্তানবুল শহরে একটা বাড়ি কিনে এই নামে এরকম একটা সত্যিকারের সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন। কল্পনার সংগ্রহালয় নয়, একেবারে সত্যি। ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি, তাদের সত্যিকারের প্রদর্শন নানা টুকিটাকি জিনিসপত্রের। এই উপন্যাসে সচেতনভাবে বার বার বাস্তব ও কল্পনাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের শেষ এবং দীর্ঘতম অধ্যায়ে (অধ্যায় ৮৪ : সুখ) লেখক ওরহান পামুক নিজেই একটা চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। বাস্তব আর পরা-বাস্তবের মিশ্রণ ঘটানোর নয়, পামুক বইতে সশরীরে এসেছেন হয়তো এ কথাও বোঝানোর জন্য যে এই বইয়ের কামালের কথা তাঁর নিজের কথা নয়, এ রচনা আত্মজৈবনিক নয়। তবু কি তাঁর জীবনের ছায়া এতে পড়েনি? যখন কামাল শোনে যে পামুক তার কাহিনিটি লিখেছেন কামালের জবানিতেই, তখন সে জানতে চায় 'আমাকে তাহলে বলুন, আপনি কখনো এরকমভাবে প্রেমে পড়েছিলেন?' পামুক জবাবে হ্যাঁ, না কিছু বলেন না। বলেন 'হুম-ম্-ম্-ম্-ম্... আমরা এখানে আমাকে নিয়ে কথা বলছি না।' তারপর চুপ করে যান।

সংগ্রহশালা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাগুলির প্রতি কামালের ঝোঁকের কথা বলেছেন। কিন্তু সে সব ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আমাদের আগ্রহ হতে পারে যেগুলি সভ্যতার বিশিষ্ট মানুষদের স্মৃতিকে উসকে দেয়, যাঁদের জীবনের প্রভাব আমাদের ওপরে ছাপ ফেলেছে, যাঁদের কথা বই পড়ে জেনেছি, তাঁদের জীবনকে এ ধরনের সংগ্রহশালা আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু ফুসুনের জীবন নিয়ে কামালের আর তাদের দুজনের আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতদের বাইরে কারও আগ্রহের কারণ পাই না। ফুসুনের উপস্থিত ও অনুপস্থিতি কামালের জীবনে অমোঘ, তার জীবনচর্চার মূলসূত্র। কিন্তু তা বড়ো ব্যক্তিগত। সংগ্রহশালাটি বড়ো ব্যক্তিগত খুঁটিনাটিতে ভরা। কারো প্রিয়জনের স্মৃতিতে গড়া সৌধ বরং সকলকেই টানে— তা সে গোরস্থানের মাঝেই হোক বা সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে এসে আমরা সেই প্রিয়বিরহের চির-শোকের সঙ্গে একাত্ম হই, কবির সাথে মনে উচ্চারণ করি— Do not ask for whom the bell tolls, the bell tolls for you.। এমনকী সম্রাট শাজাহানের তাঁর প্রিয়তম মমতাজের স্মৃতিতে করা অতি-রাজকীয় তাজমহলও আমাদের স্পর্শ করে, আমাদের হৃদয়কে দ্রব করে। সেখানে মমতাজ বা শাজাহানের ব্যক্তিগত জীবনের চিহ্নমাত্র রাখা হয়নি। সেখানে স্মৃতি সৌন্দর্য হয়ে, শান্তি হয়ে ফুটে উঠেছে। কামাল যখন লেখককে জামার পকেট থেকে বার করে ফুসুনের ছবিটি দেখায়, তখন লেখকের চোখে পড়ে ফুসুনের মুখচ্ছবিতে কোনো আনন্দ নয়, কেবল বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। যখন কামাল তাঁকে বলে ওঠে 'সবাই জানুক, আমি খুব সুখে জীবন কাটিয়েছি।' তখন আমরা তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না।

তবু যখন অনিচ্ছার সাথে, কী এক অব্যক্ত অনুভূতির তাড়নায় একবার পড়া বৃহৎ উপন্যাসটির পাতা আবার ওলটাই, বার বার ওলটাই, আবার মনটা তেতো হয়ে ওঠে, তখন মনে পড়ে যায় অপরিসর, অনালোকিত ঘরে, বন্ধুবিড়ম্বিত হয়ে, দারিদ্রে কাটানো, জীবনে ব্যর্থ এক চিত্রশিল্পীর কথা। তিনি তাঁর নড়বড়ে টেবিলের উপরে, ফ্যাকাশে দেওয়ালের প্রেক্ষাপটে একটা সাধারণ ফুলদানিতে রেখে দেখেন, মাছ থেকে তুলে আনা উজ্জ্বল প্রাণময় ফুলগুলো কী রকম বিবর্ণ, বিষণ্ণ, নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে, তাঁর সঙ্গ দেয়। যেমন প্রাণোচ্ছল, সুন্দর, পূর্ণযৌবনা ফুসুনের স্মৃতি উসকে দেয় কতগুলো নির্জীব, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় এটা-ওটা, যেখানে কামাল তার নিজস্ব সংগ্রহালয়ের চিলেকোঠার ঘরে শান্তভাবে শেষ সমাপ্তির প্রতীক্ষায় থাকে।